সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন এবং ভাষা সৈনিকদের স্বীকৃতি দাবি

মানিক লাল ঘোষ

বাঙালি জাতি এক গর্বিত জাতির নাম। এক অহংকারী জাতির নাম। যারা বুকভরা অহংকার নিয়ে বলতে পারে আমরা সেই বীরের জাতি, যে জাতি মায়ের ভাষার মান রাখতে রক্ত দিয়েছে। ভাষার জন্য রক্তদান এ এক বিরল ঘটনা। বাঙালি জাতির জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। সব বাধা বিপত্তিকে উৎরিয়ে অসীম সহাসিকতায় এগিয়ে চলে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সব প্রতিকূলতা পরাভূত করে ছিনিয়ে এনেছে বিজয়। যে বিজয় আনন্দ আর গৌরবের। বাঙালি জাতির এ গৌরবময় অর্জনের একটি দিবস ২১ ফেব্রুয়ারী আজ আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে। আর তাহলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আমাদের মা, মাটি আর মানুষকে ভালবাসার দিনটিকে বিশ্ববাসী আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। এর চেয়ে আনন্দের এবং গর্বের বিষয় একটি জাতির কাছে আর কি হতে পারে?

বাঙালি জাতির এ গৌরবময় অর্জনের জন্য একটি তারিখ আমাদের জীবনের স্মরণীয় দিন। সেদিনটিকেও আমাদের ঘটা করে পালন করা উচিত। কেননা তরুণ প্রজন্ম যেন এ তারিখটি ভুলে না যায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর এঐতিহাসিক দিন জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিস বাঙালির অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি পেশ করার আগে ইউনেস্কো ২৮টি সদস্য রাষ্ট্র এ প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করে। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে, এককালে বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার হননকারী ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ বাঙালি নিধনকারী পাকিস্তানও এ ২৮টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে এ প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থক ছিল।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু বাঙালির একার গর্বের বিষয় নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বের সব মানুষের সকল ভাষাভাষির শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মন্ডিত একটি দিন। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মাতৃভাষা দিবসের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, বিশ্বের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির নিজ নিজ মাতৃভাষাকে সম্মান জানানো এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং বিকাশকে স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদান। আমাদের গর্বের দিন আজ আন্তর্জাতিক দিন হিসেবে পালিত হচ্ছে। আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত ভাষা দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের সকল ভাষাপ্রেমী এদিনটিকে তাদের ভাষার প্রসার, প্রচার ও কল্যাণে শ্রদ্ধাভরে পালন করছে। অথচ আমাদের অর্জনকে আমরা সেভাবে পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। বাংলা ভাষার প্রচলন, ব্যবহার, বাংলা ভাষার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখনো আমরা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। আমাদের কোন জাতীয় ভাষানীতি নেই। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোথাও বাংলা, কোথাও ইংরেজী আবার কোথাও আরবি শিক্ষার মাধ্যমে জগাখিচুড়ি শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। দেশের অনেক গ্রাজুয়েট না ভালোভাবে লিখতে পারে বাংলায় একটি আবেদনপত্র না পারে ইংরেজীতে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে আমাদের আন্তরিকতার যথেষ্ট ঘাটটি রয়েছে। ভাষার জন্য জীবনদান ও ভাষার জন্য যারা লড়াই করেছেন তাদেরকে আমরা সঠিকভাবে সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছি। ভাষা সৈনিকদের রাষ্ট্রীয় কোন তালিকা নেই। তাদের অনেকেই আজ মানবেতর জীবনযাপন করেছেন। তাদের প্রতি আমাদের সঠিক সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তাদেরকেও রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে দাফনের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ব্যাপারে অনেক জেলায় একুশ উদযাপনের সভায় ভাষা সৈনিকরা দাবিও তুলেছেন। তাদের এ দাবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো কর্তব্য।

শব'র সমারোহ
পদ্মনাভ অধিকারী

আশায় ভালবসায় বাঁধা ঘর
ভেঙ্গেছে- মুক্ত আকাশটাও
হয়েছে দখল। আর মাটিতে
ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খড়-কুটোয়
পাশেই পড়ে আছে, চড়ুই- অনাবিল
পাখিদের প্রাণহীন শব যখন, এ সময়
নিঃশঙ্ক উড়া উড়িতে বাঁধ সেধেছে
নাইন এম এম আর এ কে ফর্টি সেভেনের
আতঙ্ক ছড়ান গর্জন হরহামেশাই। থেমে গেছে
পাখিদের গানের সুকণ্ঠ আর কিচিরমিচির
আনন্দ উচ্ছাস। পাশাপাশি এ ভূগোলের
এই সভ্যতার ভূ ও নরখাদর অস্ত্রদাতা মোড়ল,
আপনাদের মানুষের জন্যে মায়া কান্না থামান।
আবাবিল আর চড়ুই এর কিচিরমিচির সুর
ধ্বনি শুনি, দেখি সবুজের নির্ভয়ে বেড়ে ওঠা..।
হায় নাইন এম এম, হায় এ কে ফর্টি সেভেন।
পাহাড় আর সমতলে তোমাদের সরব
উপস্থিতি, প্রকৃতির সজিবতা কেড়ে,
বাড়িয়ে দিয়েছে নীরবতা। এখানে এখন শুধুই
আবাবিল আর স্বতঃস্ফূর্ত চড়ুইয়ের শব'র সমারোহ...।

একুশের অসমাপ্ত কবিতা
শাহনাজ পারভীন

ইয়ারলি রিভিউ শেষে পৃথিবীকে যখন পূর্ণতা দিতে এসেছিলে
মৃত্তিকার মত সহিষ্ণু হয়ে এসেছিলে
সত্যের মত নির্ভীক হয়ে এসেছিলে
পৃথিবীর মত বিপুল হয়ে এসেছিলে
আকাশের মত বিশাল হয়ে এসেছিলে
এবং সমুদ্রের মত গর্জন হয়ে এসেছিলে
তাই সব জল আর কাদা হয়ে মিশে আছো এ মাটির সাথে একাকার

দীর্ঘ পাঠের পর যেইভাবে স্বস্তিতে শান্তিতে বিশ্রামে যায়
দীর্ঘ শ্রমের পর শ্রমিক মুজুরী পেয়ে আয়েশে হারায়
সেইভাবে তোমরাও গভীর পাঠক হলে-
কঠিন শ্রমিক হলে
পৃথিবীকে দিয়ে গেলে দুইহাতে মুঠি মুঠি ফুল

মান্থলি রিভিউ শেষে তোমরা যখন এলে প্রজাপতির সৌহার্দ্য ছড়ালো আবার...

মৃত্তিকার ঔরস থেকে যেভাবে শস্যকে ছিনিয়ে আনে
সমুদ্রের বক্ষ থেকে যেইভাবে কলে[illegible]লকে ছিনিয়ে আনে
পাখির পালক থেকে যেইভাবে শুভ্রতাকে ছিনিয়ে আনে
বৃষ্টির কলতান থেকে যেইভাবে সঙ্গীতকে ছিনিয়ে আনে
এবং মেঘের ডমরু থেকে ছিনিয়ে আনা গর্জনের মত
পৃথিবীময় রেখে গেলে ঐ তপ্তশ্বাস
আহা রফিক! আহা শফিক! আহা জব্বার! তোমাদের ছিনিয়ে আনা
চিরচেনা এইসব প্রাণময় কাঙ্ক্ষিত কথা-
হতাশার হাহাকার সরিয়ে দেখ, আজ ইতিহাস!

প্রভাতে নগ্নপায়ে হাটার গল্প
নাঈম নাজমুল

কৃষ্ণ চুড়ার তলে বেদনার্ত হৃদয়ের
শ্রাবন ঝরানোর গল্প, আমার জীবনের
শ্রেষ্ঠ গল্প গুলোর অন্যতম।

সহজ সরল ভাষায় রচিত তরুন তাজা যুবকের
বুকের রক্ত-স্রোতে ভেসে আসা বর্ণমালার গল্প।
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো-
একুশে ফেব্রুয়ারির গল্প।

'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' বলতে বলতে
রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারের বুকের
তাঁজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হবার গল্প।

সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় রচিত
একে বারে নতুন একটি গল্প।
মায়ের ভাষার জন্য রক্ত ঝরানোর
এটাই প্রথম উপখ্যান।
হতভাগ্য বাংলা ভাষায় কথা বলার নির্মম গল্প।
সন্তান হারানো বাবা-মায়ের অশ্রু ঝরানোর গল্প।

অতঃপর ভীষণ কোন প্রভাতে নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে
কৃষ্ণ চুড়ার তলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর গল্প।

একুশের চেতনায়
তারা পদ দাস

চেতনায় বিকশিত ফুল
নাম তার একুশের ডাক
ভাষার স্মরণিকা হয়ে
বায়ান্নতে রক্তের শপথ।
শহীদের জীবনের দান
রাষ্ট্রভাষা বাংলার জয়
পাকিস্তানী শোষকের আশা
অবশেষে হ'ল অবসান।
রফিক, শফিক, জব্বার,...,
সংগ্রামের পথ করে দিল
আন্তর্জাতিক মুল্যায়ণে
বিশ্বমাঝে স্বীকৃতি লাভ হ'ল।
শুরু হল মুক্তির নব ইতিহাস
হানাদার বাহিনীর চির পরাজয়
একাত্তরে বাঙালীর বিজয় কেতন
বাংলার স্বাধীনতার নব অভ্যুদয়॥

উচ্ছ্বসিত তনুমন
অর্কদাশ গুপ্ত

একুশের আলোয় আলোকিত জীবন
নিজস্ব সত্ত্বায় বেঁচে থাকার স্বার্থকতা
সৃষ্টির উল্লাসে মেতে
প্রতিনিয়ত ভাঙ্গনের গান গাওয়া।
স্বার্থক জনম!

একুশের আভায় উদ্ভাসিত জীবন
জরা-জীর্ণ ছিন্ন করে বসন্তের আগমন
নতুন শপথে নতুনের আবাহন
উজ্জীবিত উত্থাপিত উচ্ছ্বসিত তনুমন।
স্বার্থক বেঁচে থাকা!

চেতনায় শুধু একুশ একুশ আর একুশ, যা
আমার অস্তিত্বের অহংকার! সৃষ্টির উল্লাসে।

অমর ভাষা শহীদ
গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

লক্ষ কোটি বাঙালীর অহংকার
অমর একুশে ফেব্রুয়ারি
মনে প্রাণে পরশে আজ তার
চলে প্রভাত ফেরী।
বাংলার পথ মাঠ প্রান্তর
লাল-সবুজ সাজে
কিশোর কিশোরীর জাগায় অন্তর
শহীদের কীর্ত্তি জাগে।
ভাষা শহীদের শহীদ মিনার
জীবন্ত বাংলা বর্ণ
সালাম জব্বার বরকত তাঁর
জাগ্রত প্রহরী অতন্দ্র।
কে বলে মাগো ঘুমায়ে তাঁরা
কফিনে মাটির ঘরে
ভেঙ্গেছে তাঁরা জনতার রুদ্ধকারা
জেগেছে অন্তরে বাহিরে।
মহাবিরত্বে বাংলার অলিন্দ পথে
সালাম জব্বার শত
নিস্পলক সারাক্ষণ রয়েছে দাঁড়ায়ে
মাগো তোমার গর্ব কত।

রক্তের গন্ধে ভাসছে সুবাতাস
তোজাম্মেল হক

'ফেলানি ঝুলছে না
ঝুলছে বাংলাদেশ'
মেঘের পরে মেঘ ভাসছে
কাটা তারের রক্ত মাখা দেখে
শোকের মাসে রোদ হাসছে।
ঢেউয়ের আঘাত নদী ভাঙ্গে কুল
কিশোরীরর ক্ষত হৃদয়ের আকুল
মেহেদী পরা লাল হাত
নেমে এলা জীবনের কালো রাত।
'শ্যাম রাখি না, কুল রাখি"
গাছের ডালে সার্বভৌম পাখি
নতুন নামে তারে কি ভানৃত
নতুন ভাবে পাশের বাড়ী ডাকি।
রক্ত মুছে যাবে ধুয়ে যাবে
আমার কালি স্মৃতি হয়ে রবে
কালি দিয়ে করি প্রতিবাদ
নিত্য দিনের বদ অভ্যাস তবে
ঝুলছে বাংলাদেশ
রক্তের গন্ধে ভাসছে সুবাতাস।

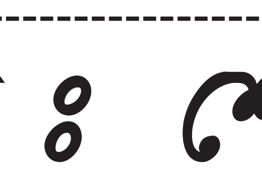

বায়ান্ন থেকে বাংলাদেশ
সৈয়দ এনায়েত করিম দাউদী

দিনে শহর জুড়ে আতঙ্ক
রাতে দেশ জুড়ে অন্ধকার
টেলিগ্রাফ পত্রিকা আর
চার ব্যান্ডে ইয়ার সংবাদ কণ্ঠে
ভেসে আসে।
পূর্ব পাকিস্তান কম্পিত
চাঁদ তারা উর্দি গায়ে,
বাংলা কথা না বোঝে রক্তচক্ষু
অস্ত্রধারী গুটি কয় অ-বাঙ্গালী
ঝাঁপিয়ে পড়ে মোটর আর থ্রি নট থ্রি নিয়ে।
বেশ কিছু বাংলা ভাষাভাষী মানব দেহ
রাজপথ আর মর্গ থেকে গুম হয়।
অধিকার প্রতিষ্ঠায় উত্তর-সুরীরা
এবার শপথ নেয়।
আর সইব না নির্যাতন
ভাষা হবে বাংলা
দেশ হবে বাংলা।
সেই থেকে সংগ্রাম আর আত্মদানে,
বায়ান্ন থেকে একাত্তর
ভাষা থেকে বাংলাদেশ।

একুশ
অশোক বিশ্বাস

একুশ তুমি এনে দিয়েছো ভাষার অধিকার,
তুমি পথ দেখিয়েছো একাত্তর স্বাধীনতার।
একুশ তুমি না এল স্বাধীন হতো না এ দেশ,
তুমি এসেছো বলেই বিদেশী শত্রুর হলো শেষ।
একুশ তোমার জন্য রফিক, শফিক দিল প্রাণ,
দামাল ছেলেরা রক্ত দিয়ে রেখেছে বাংলার মান।
একুশ তুমি আমার প্রানের আমর বাংলা ভাষা,
তুমি আমার শহীদ ভাইয়ের স্বপ্ন ভালবাসা।
একুশ তুমি চির অমর হয়েছ বিশ্বের দরবারে,
সবার মাঝে থাকবে তুমি সারাটি জীবন ধরে।

আজ জমেছে শোক
মাহবুবা মাসুমা অনু

এই দেশেতে বাংলা হবে
সবার মুখের ভাষা,
বাংলাতেই করবে প্রকাশ
সবার মনের আশা।
এই আশাতে বাংলা ভাষা
করলো সবে জয়,
কিন্তু বাংলা নিজ ভূমিতে
পাচ্ছে আজই ভয়।
ইংরেজির বেশ দাপট এখন
বাংলার নেই নাম,
এই কি তবে শহীদ ভাইয়ের
বুকের রক্তের দাম।
ব্যানার সাইনবোর্ড মিডিয়াগুলোয়
ইংরেজিরই রাজ,
এই কি কোন ভাষাপ্রীতি
দেশ প্রেমিকের কাজ।
রক্ত দিয়ে কিনলো বাংলা
মরলো কত লোক,
সেই বাংলার বুকের মাঝে
আজ জমেছে শোক।

সবুজ শাড়িতে রক্তের আল্পনা
তাসনিম মাইশা নৈরিতা

তোমাকে সবুজ শাড়িতে পরিয়েছি বায়ান্নে
তাতে এঁকেছি তাজা রক্তের আল্পনা
দিয়েছি মূল্য অনেক জীবনের বিনিময়ে
তুমি আমর মায়ের ভাষা- বাংলা ভাষা।
আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-
সে তোমারই হাত ধরে বিশ্ব দরবারে,
একুশের সেই শহীদ যারা অমর প্রাণ।
আমরা আজ ব্রত তাই দিতে সম্মান

২১ শের মালা
আসমা খাতুন

প্রভাত ফেরী লয়ে যখন দিলাম আমি পা
মনের কোঠায় ভেসে ওঠে
লাখ লাখ শহীদ আত্মার কথা।
ঘুমিয়ে ওঠা কোমল হৃদয়ে
শহীদ স্মরনী বেশে
চির অমর সোনার বরণ
লাখ লাখ শহীদ সবে।
লাল সবুজের বৃত্ত করে
উড়িয়ে মোর দেশে
আজিকে আমরা সম্মান করি
তোমাদের পদ তলে
রক্তে ঢালা রাজ পথ
সকল সারিবদ্ধ সেজে
স্মরন করি বারে বারে
ভূলবনা সংগীত গেয়ে
পবিত্র ফুলের সকল পাপড়ি
সম্মানের মালা করে
দুই হাতে রেখেছি ধরে
তোমাদের গলে পরাব বলে।

মাতৃভাষা বাংলা চাই
হুরাইরা হোসেন সরকার

মাতৃভাষা বাংলার জন্য দিলো যারা প্রাণ,
তাদের স্মৃতি কভুও যেন, হয়না বুঝি স্লান।
মাতৃভাষা বাংলা, মোদের কামনারই বানী,
একুশ মোদের হৃদয় গর্ঝাথা সবাই মোরা জানি।
হাজার রক্তে স্নান করা সবার হৃদয় ঘানি,
একুশ বুঝি বারে বারে আনে আমার টানি।
রফিক, শফিক, সালাম, বরকতের রক্তে ভেজা এ ঘাস,
বাংলাদেশের মানচিত্রে তাইতো দীর্ঘশ্বাস।
দেশটা মোদের সোনার মনি সবুজের মাঝেই লাল,
চৌদ্দ কোটি মানুষ মিলে ধরি বাংলার হাল।
অস্ত্র ধরি সবাই মোরা বাংলা ভাষার জন্য,
বিবেক দিয়ে জয় করি সব হোক না জীবন ধন্য।

'স্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি'
আমিন উদ্দীন আহমেদ

আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
এসেছে ফিরিয়া
২১ ফেব্রুয়ারি
হৃদয়ের মূলে,
উঠিল জ্বলে।
বেদনার আহাজারী।
আমরা কি ভুলিতে পারি?
যত বর্ষ যাবে,
নতুত্ব পাবে,
বাংলা মোদের ভাষা
উদিবে কত কবি
শতশত রবী।
পুরাবে মনের আশা।
আমরা কি ভুলিতে পারি?
যুগ ও যুগান্তরে,
দেশ ও দেশান্তরে,
ছড়িয়ে গেল এর বেদনা।
কয়টি সোনার ছেলে,
বুকের রক্ত ঢেলে,
মা, মা, ডাকা ভুলিল না।
আমরা কি ভুলিতে পারি?২
শাসকের রক্ত চক্ষু,
ভয় করিল না কভু?
সকলে করিল বিদ্রোহ।
সেই যে সরকার,
হুচোট খেল বারবার,
তবু শোষন করিল অহরহ।
আমরা কি ভুলিতে পারি?
ছালাম বরকত রফিক,
হারালো না দিক,
নিজেদের রক্ত দিল ঢেলে।
আবার অনেকে গেল জেলে।
আমরা কি ভুলিতে পারি।
প্রাণে আরো জোরে দিল নাড়া,
'দুনিয়ায় পড়ে গেল সাড়া
ইতিহাসের হলো না ইতি
আমরা কি কভু ভুলিতে পারি?
প্রাণ কাঁদানো একুশে ফেব্রুয়ারি।

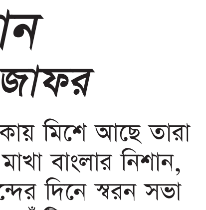

সূর্য্য সন্তান
শেখ আবু জাফর

লাল সবুজের পতাকায় মিশে আছে তারা
লক্ষ শহীদের রক্ত মাখা বাংলার নিশান,
বিজয়ের এই আনন্দের দিনে স্বরন সভা
বাংলার মাটি দুরজয় খাঁটি সোনা
আমরা করিবো পর্ব রক্ষা করিবো জীবন দিয়ে,
কোন শাসক গোষ্ঠি না করিতে পারে আঘাত
এই রক্ত ঝরা বাংলায়।
রক্তে রক্তে লাল হয়েছে এই বাংলার মাটি
আর কত রক্ত দিয়ে কিনবো স্বাধীনতা
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ কত টুকু হয়েছি স্বাধীন,
এই প্রশ্ন জাগলে মনে
ঘর খানা মোর খাঁ-খাঁ করে
বন্দি ঘরের দুয়ার
এই ঘরেতে কত স্মৃতি হল না তার বাসর
নতুনবউকে ফেলে রেখে আসছি বলে গেল
চল্লিশ বছর পার হয়েছে
খোকা কি আর ফেরে
কোথায় কবর কোথায় তাহার দেহ
আমার চোখটা অন্ধের পথে, পথের দিকে চেয়ে।
ও আমার বাংলাদেশ উত্তর কি তুমি দেবে
সূর্য্য সন্তানরা জীবন দিয়ে রেখে গেছে তোমার
কি সুখ দিলে আমার?

অমর একুশে ঃ শেঁকড়ের সন্ধানে

আমিরুল ইসলাম রন্টু

একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালির জাতীয় জীবনের মহিমামন্ডিত অত্যূজ্জ্বল এক মাইলফলক। এই মাইল ফলককে দিকদর্শন ধরে একুশের প্রশস্থ রাস্তা বেয়ে বাঙালি স্বাধীনতার দীর্ঘ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। একুশ বাঙালির জীবনে আদৌ কোন ছোটখাটো ঘটনা ছিল না। একুশের যথাযথ মূল্যায়ণ সেভাবেই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মূল্যায়ণ ঘাটতি থেকেই যায়। সেটা অনেকটা অজ্ঞতা থেকে কিম্বা ইতিহাস জানার অসম্পন্নতা থেকে। আজ থেকে ৬০ বছর আগের হওয়ায় একুশে ফেব্রুয়ারীর সকল ঘটনা স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভবের নামান্তর, বরং ও সময়ের স্মৃতি ধারীরা আজ ব্যাপক সংখ্যায় লোকান্তরিত। ফলে, একুশের বিষয় অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে-বিশেষ করে, মফ:স্বল অঞ্চলে। যে সব বিষয় বই পুস্তকে কিম্বা নানা লেখা জোকায় ধারিত হয়েছে, তা সময়ের নিরিখে বেশ কিছুটা যেমন অসম্পূণ, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে সব স্মৃতিকে অবিকল সামনে আনা নিদারুন জটিল একটা বিষয়। আমরা সম্প্রতি (ফ্রেব্রুয়ারী মাস শুরু হলে) কেন্দ্র হতে শুরু করে অনেক জেলা ভিত্তিক প্রথম শহীদ মিনার নির্মানের ইতিহাস খবরের কাগজে পাচ্ছি। ৬০ বছর পুর্বের হওয়ার সেসব ইতিহাসের মধ্যে কতটুকু সঠিকতা আছে, কতটুকু বিভ্রান্তি এসেছে, তা নির্ণয় করা কঠিণ। তাছাড়া, সে সময়ে ছিল বৃহত্তর জেলা। হাল জেলাগুলোর সিংহভাগ ছিল মহকুমা। মহকুমা সম্পৃক্ত বৃহত্তর জেলায় শহীদ মিনার গড়ে উঠার বিষয়ে কোন দ্বিমত করার প্রশ্ন উঠা সঙ্গত নয় ঠিক, কিন্তু বৃহত্তর জেলার বাইরে সকল মহকুমা (বর্তমান হাল জেলা) ও থানাতে প্রথম দিকেই শহীদ মিনার গড়ে উঠা নিয়ে সন্দেহ-সংশয়-বিতর্ক থাকতে পারে। সে সময় শহীদ মিনার গড়ে উঠা ছিলো অনেকটা আবেগ নির্ভর-স্থানীয় ভাবে সাহসী ছাত্র নেতৃত্ব থাকলেই সেটা সম্ভব ছিলো। মহকুমা গুলো আজ হাল জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। কোন কোন থানা মহকুমা নয়, জেলাতেও রূপান্তরিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর আনুষ্ঠানিকতা আজ শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক নয়, আন্তর্জাতিক ভাবেই স্বীকৃত একটি বিষয়। আজ এদেশে সকল উচ্চ হতে শুরু করে নিম্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে-হচ্ছে। ধারা অব্যাহত আছে। এতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, এমনকি- প্রশাসনিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এটা চিন্তা করাও ছিলো নিদারুন বাতুলতা। প্রথম দিকে ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে স্বল্প সংখ্যক জাতীয়তাবাদী-গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা ছিলো। সামাজিক নেতৃত্বের যে অংশটা কেবল প্রগতিশীল ছিলেন তাদেরই মৌন সমর্থন ছিলো। অপ্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব আগাগোড়া বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রীয় করণের বিরোধীতা করে এসেছেন-ঐতিহ্যগত সূত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেও। এমন কি এখনও।

যশোর সে সময় ছিলো বৃহত্তর জেলা হেড কোয়ার্টার। '৪৮ এ রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন শুরু হলেই যে সকল জেলাতে সুতীব্র প্রভাব পড়ে, যশোর ছিলো সে সবের মধ্যে অন্যতম। '৪৮ এ যশোর শহর ভাষা আন্দোলনে সবিশেষ উদ্বেল হয়ে ওঠে। সে সময় যশোর শহরে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশী নির্যাতন শুধু তুঙ্গে ওঠেনি, এমনকি ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলি পর্যন্ত বর্ষিত হয়েছিলো। যশোর রেল ষ্টেশন এলাকায় পুলিশী ছত্রছায়ায় বিহারীরা হিন্দু নাগরিকের দোকান-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট চালিয়েছিলো। অনেক বিশিষ্ট হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কোতয়ালী থানার বিহারী দারোগা ফাম উদ্দীনের নির্যাতন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো। বিহারী পুলিশ থানা হাজতের অভ্যন্তরে ভাষা-হাজতীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছিলো। দাবী করা হয়-গ্রেফতারকৃত ভাষা-হাজতীদের পানির বদলে মূত্র পানে বাধ্য করা হয়। বিহারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সকল প্রশ্নে সরকার সমর্থক, বিশেষ করে বিহারীদের পৃষ্টপোষকতা দান করলে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য শহীদ এ্যাডঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংসদ অধিবেশনে যশোরে পুলিশী নির্যাতনের বাড়াবাড়ির অভিযোগ তুলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ,এইচ, নোমানীকে প্রত্যাহার করে নেবার দাবি তুললে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন অভিযোগ স্বীকার ও দাবি মেনে নেন।

'৫২ তে একুশে ফেব্রুযারী ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি বর্ষিত হলে জব্বার, রফিক, শফিক, সালাম, বরকত সহ জানা অজানা আর বেশ কয়েকজনের শাহাদৎ বরণের খবর পূর্ব বাংলার সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র ছাত্র-জনতা রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে নেমে পড়ে। সে এক প্রচন্ড গণজাগরণ। যশোর এম, এম, কলেজ ছাত্র নেতৃত্বের উদ্দ্যোগে যশোর শহরের রাজপথে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। ছাত্রীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। '৪৮ এ ছাত্র নেতৃত্বের শীর্ষ ভূমিকায় নাম আসে মরহুম আলমগীর সিদ্দিকী, শেখ আমান উল্লাহ প্রমুখের নাম। ছাত্রী নেতৃত্বের তালিকায় শীর্ষে থাকে কাজীপাড়ার মেয়ে মরহুমা হামিদা রহমান গুপী। তারা সকলেই ছিলেন এম,এম কলেজের ছাত্র। '৫২ তে শহরের তাবৎ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে। ছড়িয়ে পড়ে মহকুমা, ক্ষেত্র বিশেষে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও। তবে '৪৮ ও '৫২ তে মূল ছাত্র নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে। '৫২ তে যশোর শহরের এম এম কলেজ সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিহ হয়। তারা গ্রামগঞ্জের হাই স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল, এম,ই স্কুলের ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা উদ্যোগ নেন। দু'একটি উদাহরণ এখানে টানা চলে। ঝিকরগাছার ছাত্ররা এম এম কলেজের একজন স্থানীয় ছাত্র নেতার নেতৃত্বে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নিমিত্ত রেল লাইনের লোহার পাটি তুলে ফেলে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত করেন। মুসলিম একাডেমী, যশোরের একজন ছাত্র নেতার বক্তব্যে চূড়ামনকাটি স্কুলের ছাত্ররা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা ওই বিকালেই চুড়ামনকাটি বাজারে হালকা বিক্ষোভ মিছিল করে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারী মৌলবী শিক্ষক নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রথমে চুড়ামনকাটি বাজারে, পরে পার্শ্ববর্তী বিজয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ গোটা গ্রাম মিছিল সহকারে প্রদক্ষিণ করে, পুনরায় চুড়ামনকাটি বাজারে ফিরে গিয়ে মিছিল করে মেহেরুল্লাহ নগর রেলষ্টেশনে পৌঁছে, দর্শনাগামী একটি লোকাল ট্রেনে উঠে বার বাজার রেলষ্টেশনে নেমে মিছিল সহকারে বাজার প্রদক্ষিণ করে হাই স্কুল চত্বরে পিকেটিং শুরু করেন। কিন্তু স্কুলের একজন মুসলিম লীগ পন্থী শিক্ষক মুজিবর রহমান মাষ্টারের অনমনীয়তার কারণে ছাত্রদের স্কুলের বাইরে টেনে আনা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ সময় পিকেটিং শেষে চুড়ামনকাটি স্কুলের ছাত্ররা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতি একটা ট্রেনে পুনরায় চুড়ামনকাটিতে ফিরে এসেছিলেন। এটা ছিলো ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল। যশোর জেলার মফ:স্বল স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও বেশ কিছু উদাহরণ টানা যেতে পারে। এসব বিষয়গুলি ইতিহাসের অংশ। মফ:স্বল অঞ্চলের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ধারণ করা এখন আজ সময়ের দাবি।

এবার আসি যশোর শহরে শহীদ মিনার নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়-'৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ১ম প্রহরেই যশোর সার্কিট হাউসের সামনে মুজিব সড়কের (সাবেক জিন্নাহ রোড) পূর্ব পার্শ্বে মশিয়ূর রহমান সরদারের (পুটে সরদার) বাড়ীর সামনে যশোরের প্রথম শহীদ মিনার নির্মান করে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল দিয়ে মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি প্রথম সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সে সময় যশোরে ফুলের দোকান ছিলো না। বিভিন্ন সরকারী ও পারিবারিক বাগান হতে ফুল তুলে সেই ফুলে শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো। জানামতে, এই ধারা অন্তত: ৭০ শতক পর্যন্ত চলেছিলো। পুটে সরদারের বাড়ীর সামনে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান। বাহান্নোতে যশোর মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন আহম্মদ আলী সরদার। পুটে সরদার ছিলেন আহম্মদ আলী সরদারের আপন অধ:স্তন ভাই। তিনিও সে সময় মুসলিম লীগের একজন নেতা ছিলেন। ক্রোধ প্রশমনের জন্য যশোরের তদানিন্তন মুসলিম লীগ নেতা কিম্বা নেতার ভাই হওয়াতেই তার বাড়ীর সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। অন্যদিকে সরকারের ক্রোধান্বিত পুলিশের রক্ত চক্ষুর হাত হতে অব্যাহতির লক্ষ্যে ওই নিরিবিলি এলাকাটা শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য বেছে নেয়া হয়। যদিও কোতয়ালী থানা, যশোর কালেক্টরেট, কিম্বা পুরানো এম,এম, কলেজ চত্ত্বর বিবেচনায় থাকলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে আপাতত: সে সব প্রস্তাব বর্জিত হয়। সর্বশেষ প্রস্তাবটা যে যে কারণে বিবেচনায় নেওয়া তার মধ্যে আর যে কারণটি মূখ্য ছিলো, তা হলো- সার্কিট হাউসে অবস্থানরত দেশি-বিদেশি তাবৎ ভি.আই.পি ও ভি.ভি.আই.পিদের নজরে পড়ার জন্যে তাদের ঢোকা ও বেরুবার মুখেই শহীদ মিনারের এই প্রতিষ্ঠা। ফলে, ধরে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয় যে, ত্রিমুখী লক্ষ্য সমৃদ্ধতা নিয়েই যশোরের প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। তবে থানার সামনে 'গজগীরে' (মধু সুইটের সামনে) চৌরাস্তার কেন্দ্রস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় থাকলেও সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরার কারণে তাৎক্ষণিক সেটা সম্ভব না হলেও আকাঙ্খাটা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নই। ছাত্র নেতৃত্ব সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। দাবি করা হয়, পরের বছর (১৯৫৩) ভাষার দাবিতে ছাত্ররা যখন আরও সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতিতে ২০ ফেব্রুয়ারী রাতে ছাত্র নেতৃত্ব কোতয়ালী থানার সামনে 'গজগীরে' আলগা ইট দ্বারা শহীদ মিনারের অবয়ব গড়ে তোলা হয়। পরদিন ভোরে প্রভাত ফেরি শেষে নবনির্মিত শহীদ মিনারে ২১ শের সকালেই পুষ্প গুচ্ছ অর্পন করা হয় কতকটা চ্যালেঞ্জিং কৌশলে। কিন্তু পুলিশ ওই দিনেই তা ভেঙ্গে ফেলে। সেখানে কয়েকদিন কিছু আলগা ইট পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে, পুনরায় পুটে সরদারের বাড়ীর সামনের শহীদ মিনার ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে (মূখ্য মন্ত্রী আতোয়ার রহমান খান) এম এম কলেজ (পুরানো চত্ত্বর) প্রশাসনিক ভবনের সামনে তৃতীয় শহীদ মিনার নির্মিত হয়। দাবি করা হয়- তখন প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে মরহুম আব্দুল হাই সাহেব এসে গেছেন, মরহুম আব্দুর রাজ্জাক খান তখন কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি,এস)। পরবর্তী সময়ে শহীদ মিনার স্থানান্তরিত হয় (সম্ভবত ১৯৬৫) এম, এম, কলেজ নতুন চত্ত্বরে (বর্তমান শহীদ মিনার) এবং অদ্যাবধি সেখানে তা চলছে। এই গোটা আমলটা ছিলো বৃহত্তর যশোর জেলা। পরবর্তীতে যশোর, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল জেলা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ৭ টার স্থলে আজ থানা ৮টি হাল যশোর জেলাতেই, যেটা অতীতে ছিলো সদর মহকুমা। আজকের সকল হাল জেলা, উপজেলা (থানা) এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের স্কুল, কলেজের প্রায় প্রতিটিতে শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে। শহীদ মিনার এখন আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যশোরের ভূমিকা

মাস্টার শরিফুল ইসলাম

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পর হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৫,৮৯৮ বর্গমাইল। এখানে অল্প সংখ্যক উপজাতি ছাড়া বাকি সবাই বাংলা ভাষাভাষি। দেশ স্বাধীন হবার পর ভাষার প্রশ্নে সরকারের সাথে মত পার্থক্য দেখা দেয়। সরকার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পুশতু, বেলুচ ভাষাকে পাশ কাটিয়ে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। অন্যান্য চারটি ভাষার মানুষ কোন প্রকার আপত্তি না করলেও বাঙালীরা তা মেনে নেয় না। বাংলার মানুষ এই ঘোষণাকে প্রত্যাখান করে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। বাংলাদেশের বিভি-ন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি, বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছে দেয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতির কাছে প্রধান হিসেবে দেখা দেয়। সবার মুখে একটি কথা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়'। এই আন্দোলনে যশোরের ভূমিকা ছিল অনন্য। সংগ্রামী যশোরবাসী ভাষা আন্দোলনের প্রথম থেকেই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীনতার পূর্ব থেকে যশোরের মানুষ ভাষার প্রশ্নে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আজাদ পত্রিকায় বাংলার ভাষার বিরুদ্ধে কিছু লেখা বের হয়। এর প্রতিবাদে ১০ জুলাই কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটা পত্রে সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। এই পত্রটি লেখেন যশোরের পুরাতন কসবার হামিদা রহমান (গোপী)। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ 'বাঙালী হিসেবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করেছিলাম তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করব না কেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় আজাদের পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার বিরুদ্ধে যুক্ত দেখে খুবই দুঃখ হয়। আমাদের বাঙালী এত দিনের সাহিত্যকলা সবই কি আজ ভুলে যেতে হবে ? কেমন করে ভুলে যাব আমরা আকরাম খাঁর লেখা কুরআনের তরজমা, কেমন করে ভুলে যাব তার লেখা মোস্তফা চরিত্র ? কেমন করে ভুলে যাব নজরুলের গান ? এ সাহিত্য কি উর্দুতে অনুবাদ হবে। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ আবার তার কলম উর্দুর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করবেন ? পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল যশোরের ঐতিহ্যবাহী মাইকেল মধুসূদন কলেজের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ভবন। যা এখন অযত্নে জীর্ন শীর্ন অবস্থায় কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভবনের উত্তর দিকে অবস্থিত এলভি এম (লাল বিহারী মিত্র হল) লেকচার হল নামে পরিচিত। এই হলটিতেই রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর ২৭ অথবা ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে এই লেকচার হলে এক ছাত্র সভায় আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ মার্চ কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। সেদিনের ছাত্র সভায় যারা বক্তৃতা করেন তারা হলেন, আলমগীর সিদ্দিকী, সৈয়দ আফজাল হোসেন, আফসার আহমেদ সিদ্দিকী, হামিদা রহমান (গোপী), সুধীর কুমার রায়, রঞ্জিত মিত্র, নাজিম উদ্দিন, হাসমত উল্লাহ জোয়ারদার।

এরপর ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ ঢাকা থেকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। এই ডাকে সারা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, দোকানপাট সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। কিন্তু যশোর ছিল ব্যতিক্রম। সেদিন যশোর ছিল উদ্বেলিত। সারা যশোরের সমস্ত দোকানপাট, গাড়ি-ঘোড়া, যানবাহন বন্ধ থাকে। সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে মিছিলে যোগদান করে। একমাত্র মোমিন গার্লস স্কুলের মেয়েরা প্রথমদিকে মিছিলে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

এই সময় যশোরের চুড়িপট্টি ছিল ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এই দিন চুড়িপট্টি থেকে দুইশত ছাত্রের একটি বিশাল মিছিল বের হয়। এই মিছিলটি চিত্রার মোড় হয়ে ছাত্র জনতার মূল মিছিলের সহিত যোগদান করে। মিছিলটি মোমিন গার্লস স্কুলের সামনে হাজির হয় এবং মোমিন গার্লস স্কুলের মেয়েদের মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য শ্লোগান দিতে থাকে। হামিদা রহমান কয়েকজন মেয়েকে সাথে নিয়ে স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই সময় যশোরের ডিসি নোমানী সাহেবের মেয়ে এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে মিছিলের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন এবং সমস্ত মেয়েরা মিছিলে যোগদান করে।

মিছিলটি আস্তে আস্তে মুসলিম একাডেমী হয়ে কালেক্টরেট ভবন এলাকায় প্রবেশ করে এবং রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে। নোমানী সাহেব ছিলেন একজন অবাঙালী। তিনি মনে প্রাণে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার বিরোধী ছিলেন। ডিসি সাহেব এই মিছিল প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ব্যাপকভাবে লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, সেল, বেনেট ব্যবহার করে। অনেকের মতে ফাঁকা গুলি বর্ষণও করে।

পুলিশের আক্রমনে আলমগীর সিদ্দিকীসহ বহু ছাত্র নেতা আহত হয়। ছাত্রদের ডাবের খোলা আর ইটের খোয়ার আঘাতে ১০/১২ জন পুলিশ আহত হয়। এদের মধ্যে অবাঙালী দারোগা ফরাস উদ্দিনের অবস্থা গুরুতর ছিল। ডাক্তার রতন কুমার আহতদের চিকিৎসা প্রদান করেন। পুলিশ দড়াটানার মোড়ে তাজ হোটেলের ভিতর ঢুকে হোটেলের কর্মচারিদের উপর চরমভাবে অত্যাচার করে এবং হোটেলের ভিতর পলায়নরত ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। অবাঙালীরা পুলিশকে সাহায্য করে এই সময়।

মিছিলটি এখানে ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন বিকেলে শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সারা শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার সারা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন।

১১ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র শহরে অরাজকতা, বিশৃংখলা বিরাজ করতে থাকে। ১৮ মার্চ অবস্থা চরম পর্যায়ে নেমে আসে। এই সময় বিপুল সংখ্যক বিহারী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শহরে প্রবেশ করে।

এই দিন বিকেলে অবাঙালীদের একটা দল রেল স্টেশনে প্রবেশ করে। নিরীহ জনগণের উপর চরম নির্যাতন চালায়। লুটপাট করে। বহু মানুষ ভীত হয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। বিহারী ও পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র নাথ সরকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন সাহেবকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠান। তিনি তৎকালীন ডিসিকে পক্ষপাতিত্বের কারণে দলীয় এবং সার্বিক পরিস্থিতি তদন্তের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন সাহেবের প্রতিকারের এবং তদন্তের আশ্বাস দেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন সাহেব কোন তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেননি। এই আন্দোলনে বহু ছাত্র নেতা সাধারণ মানুষও গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর থানায় তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি পিপাশার্ত বন্দিদেরকে মূত্র পান করতে দেয়া হয়। পুলিশ সেদিন যাদের গ্রেফতার করেন তাদের মধ্যে ছিল মশিয়ার রহমান, কাজী আব্দুর রকিব, অনন্ত মিত্র, পবিত্র ধর, রবি সাহা, হাবিবুর রহমান, লুৎফর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, গোলাম মোর্তজা, আফজাল হোসেন, এস.এম এইচ জিন্না, রঞ্জিত মিত্র। এদের মুক্তির দাবিতে ১২ ও ১৩ মার্চ হরতাল পালিত হয়। ১৩ মার্চ সকালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ হলে পুলিশ গুলি ছোড়ে। পুলিশ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালান। এর প্রতিবাদে ১৪ মার্চ পুনরায় হরতাল পালিত হয়। এরপর পুলিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে হাবিবুর রহমান, আব্দুল হক, শান্তিময় ঘোষ, রঞ্জন মিত্র, হিরণ সেন, সুরোধ রায় প্রমুখ। ১৮ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে বন্দি মুক্তি দিবস পালিত হয়। এই দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমানী সাহেবের ভূমিকা ছিল জঘন্য। তিনি বাঙালী বিহারী দাঙ্গা বাধিয়ে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে বিপদগামী করার চেষ্টা করেন। বিকেল ৪টায় সন্ধ্যা আইন জারী ও সন্ধ্যায় শহরে বেলুচ রেজিমেন্ট নিয়োগ করেন।

এরপর ১১ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনায় উঠান এবং যশোরের অবস্থা আইন পরিষদে তুলে ধরেন। পরবর্তী বছর রাজশাহী বিভাগের কমিশনার নুরুন্নবী চৌধুরী যশোরে আসেন ও ঘটনা তদন্ত করেন কিন্তু সে তদন্ত রিপোর্ট কোন দিনই প্রকাশ হয়নি। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ভাষা আন্দোলন পরিষদের সহিত মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের চুক্তি স্বাক্ষরের ১৭ দিন পর যশোরের নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেয়া হয়। যশোরের ভাষা পাগল মানুষ ফুলের তোড়া দিয়ে টাউন হল মাঠে তাদের সম্মর্ধনা দেয়।

এভাবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যশোরে ছাত্র জনতার আন্দোলন চলতে থাকে। যশোরের ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি ছিল। ১) সর্ব দলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ অপরটি ছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে বিশেষ ভূমিকায় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্র আলমগীর সিদ্দিকী (আহ্বায়ক), পুরাতন কসবার হামিদা রহমান (গোপী) (যুগ্ম আহ্বায়ক), ডা. জীবন রতন ধর (সম্পাদক), ইয়াজদান চৌধুরী, অধ্যাপক শরীফ হোসেন, একরামুল হক, অ্যাড আব্দুল আলী, অ্যাড. আব্দুর রশিদ, আব্দুর রাজ্জাক বিল্লাহ, নুরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যশোর ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের নেতৃত্ব দেন, বিভিন্ন সভায় সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, তাদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন মরহুম সৈয়দ আফজাল হোসেন, মরহুম আফসার আহমেদ সিদ্দিকী, শেখ আমানুর (কলারোয়া), মরহুম বজলুর আলম খান, নুরুল ইসলাম, মরহুম এস এস গজনবী, মরহুম তৌফিক ইসলাম, মরহুম রেজা খান, মরহুম আজিজ খান, মরহুম মোর্শেদ সাহানা, বাবু রঞ্জিত মিত্র, মরহুম ওসমান গনি (চৌগাছা), শহীদ আবুল কাশেম খান, মরহুম অ্যাড. জিন্না, শ্রী কেষ্ট মজুমদার, মরহুম হাফেজ জি আর মাহমুদী, জিয়াউল হক, মরহুম হাবিবুর রহমান, সুলতান উজ জামান (প্রাক্তন ডিসি, যশোর) আব্দুস সাত্তার, নুরুল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, ওলিউল্লা, কামরুজ্জামান (ঝিনাইদহ), কাজী আব্দুর রাকিব (অবঃ লেঃ কর্নেল), মরহুম একরামুল হক, আশরাফ আলী, মরহুম হায়দার আলী, মরহুম মাহমুদুল হক, তৌহিদুর রহমান, মাহমুদ হোসেন, মরহুম আব্দুস সাত্তার, কাজী আব্দুস শহিদ লাল, মরহুম আবুল খায়ের, আব্দুল হাই, মরহুম আব্দুল মতিন, সিরাজুল ইসলামসহ আরো অনেকে।

সেদিন যশোরের রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ডা. জীবন রতন ধর, মরহুম অ্যাড. হাবিবুর রহমান, শহিদ অ্যাড. মশিয়ুর রহমান (প্রাক্তন মন্ত্রী) মরহুম আব্দুল খালেক (প্রাক্তন মন্ত্রী) আবুল কাশেম (বনগাঁ), মরহুম মোশাররফ হোসেন খান, মরহুম অধ্যক্ষ আব্দুল হাই, মরহুম অ্যাড. রওশন আলী, মোঃ রবিউল ইসলাম (বনগা), শহীদ শেখ আবু তালেব, মরহুম মুনসুর আলী, বাবু সতীশ দত্ত, মরহুম আনোয়ার ইকবাল, গায়ক হায়দার আলী, অজিত বাবু, মনিরুজ্জামান সহ আরো অনেক নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী। সেই সময় যশোরের সকল মহাকুমা থানা হেড কোয়ার্টারের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। নেতৃত্বে ছিল প্রগতিশীল ছাত্র নেতৃত্ব।

১৯৫২ এর একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে স্বৈরাচার সরকারের গুলিতে যে সমস্ত ছাত্ররা (ছালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিক) শহীদ হয় তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে যশোরের ভাষা সংগ্রাম পরিষদ যশোরে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে। সর্বপ্রথম মশিয়ার রহমান সরদারের বাড়ির সামনে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে স্থান পরিবর্তন করে থানার সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুলিশের বাধার কারণে সম্ভব হয় না। পরবর্তীকালে বর্তমান প্রেসক্লাবের ঐখানে খোলা জায়গায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এইখানে শহীদ মিনার ছিল। পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের সময় উক্ত শহীদ মিনারটি এম এম কলেজের (পুরাতন কলেজ) অফিসের সামনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরবর্তীকালে এম.এম কলেজের নতুন ভবন স্থাপনের পর নতুন করে এখানে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময় মাঠ সম্প্রসারন কাজের সুবিধার্থে মাঠের পূর্বপাশে আর একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

ইতিহাসে এদের নাম লেখা রবে
মোঃ সামসুজ্জামান

একাত্তরের এক রাতে শুয়ে আছি নাছির উদ্দীনের
ঘরের খোলা বারান্দায় রাতে অপারেশন সেরে
সবে মাত্র এই বারান্দায় আস্তানা গেড়ে শুয়ে পড়েছি।
হঠাৎ দ্যায়োড়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়-তাকিয়ে দেখি
গ্রামের দু'জন রাজাকার দাঁড়িয়ে আমাকে চোকি দিচ্ছে।
ওদের ফিসফিসেনি কথায় মনে হল ওরা আমাকে ধরে
এই গভীর রাতে নিয়ে যাবে মাঠের কোন এক নিরিবিলি
জায়গায় তারপর ব্র্যাশ ফায়ারে ঝাঝরা করে দেবে
আমার বুক। বুঝতে পেরে পালিয়ে গেলাম নিস্তব্দ
নিরবে ঐ গভীর অন্ধকার রাতে। সে রাতে ওরা আমাকে
মারতে পারেনি-তারপর যুদ্ধের নয় মাস
আমার কেটেছে রণাঙ্গণে-জীবন মৃত্যু ভালোবাসার
মুখোমুখি দাড়িয়ে মরণ পন যুদ্ধ করেছি একাত্তরের
শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে-যারা পাকিস্তানী-আলবদর, রাজাকার
আলশামস, তথাকথিত শান্তি বাহিনীর নামে
অশান্তি সৃষ্টিকারী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থানকারী
ঐসব শত্রুদের হননে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছি।
গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের ঝুকি নিয়ে এদেশের
স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীরের রক্ত ঝরিয়েছিল-এখন তারা
নাছিরউদ্দীন চেয়ারম্যানের করুনায় মাঝে মাঝে
কিছু কিছু সাহায্য অনুদান, রিলিফের মালামাল পেয়ে
কোনরকম বেঁচে আছে প্রাণে।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এদের নামও লেখা রবে সগৌরবে।

নগ্নতার বিশুদ্ধতা অর্জন
আহমেদ মাহবুব ফারুক

আমরা অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি বারবার
চোখ বন্ধ রেখে, আলোকে অন্ধ করে
দিনকে রাতে গড়িয়ে,
জোৎস্নাকে আঁধার ভেবে-
এভাবে সচলকে অচল বানিয়ে,
জীবনের অপমৃত্যু ঘটিয়ে
প্রতিনিয়ত নিজেদের উৎসর্গ করি
কাঙ্খিত নর্দমায়।
তারপর চতুস্পদে হেটে বেড়াই,
বিষ্টা ছড়াই, পরিবেশ গড়ি মহানন্দে।
আমাদের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন।
সমস্ত আবরন ফেলে
আসুন নগ্ননতার গহীন অরণ্যে অবগাহন
শেষে অন্তত একটিবার নিজের।

আমার বাংলা
গাজী শহিদুল ইসলাম

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা একুশ আমার গর্ব
একুশ নিয়ে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করব।
বাংলায় আমার ভোরের পাখি করে কলরব
বাংলা আমার মনের ভাষা বাংলা আমার সব।
বাংলায় আমি কবিতা লেখি বাংলায় লেখি গান
বাংলায় আমি ছড়া লেখি বাংলায় গল্পের প্রাণ।
রক্ত দিয়ে কেনা বাংলা সবার চেয়ে দামি
ভাগ্যগুনে জন্মেছি এই বাংলায় আমি।
মায়ের স্নেহ বাবার আদর পেয়েছি বাংলায়
শাসন বারণ সব পেয়েছি আমার এই ভাষায়।
প্রিয়তমা ভালবাসে এই ভাষারই সুরে
যে যায় বল যাব না আমি বাংলা ছেড়ে দুরে।

অপেক্ষার প্রহরগোনা
জিএম মুছা

কিছু কিছু স্মৃতি ঝরে পড়ে বিস্মৃতির বহ্নি শিখার ছাঁই
ভঁস্ম হয়ে, কখন কখন পথ চলে এক সাথে স্মৃতি-বিস্মৃতি।
অতীত স্মৃতির দরজা-জানালা, ভেন্টিলেটরে এখন ময়লা
জমেছে ঢের, মৃদু বাতাসে কর্ণ কুহরে কিছু কিছু শব্দ
বড় বেশী বেশুরা লাগে, তবুও আগামীদিনের বেচে
থাকার নতুন স্বপ্নে বিভোর, বছরের পর বছর
সকল ব্যাথা বেদনা, দুঃখ আর যাতনা বুকে চেপে
আজও বেচে আছে ভাষা শহীদের মা। হৃদয়ের
কার্ণিশে শুইয়ে স্বপ্ন দেখে, বালিশে কান পেতে নির্ঘুম
রাত্রি কাটায় শহীদ মাতা, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, হঠাৎ
প্রচন্ড শব্দে আতকে ওঠে ঘুম ভাঙ্গে, ঝাঁপসা চোখে
তাকিয়ে থাকে ক্ষীণ আলোর দিকে, ধীরে-ধীরে
ম্লান হয় পুরোন দিনের সকল স্মৃতি-বিস্মৃতি।
প্রতিক্ষায় দিন কাটায়, অপেক্ষার প্রহর গুনে
আরোও একটি বছর।

একুশ
তাজনীন আক্তার বর্ষা

একুশ আমার রক্তঝরা-
শহীদ ভায়ের দান,
একুশ আমার ফিরে পাওয়া
বাংলা ভাষার মান।
একুশ আমার শহীদ ভায়ের
রক্ত দিয়ে লেখা,
একুশ আমার মাতৃ মুক্তির
সংগ্রাম করতে শেখা।
একুশ আমার রক্তাক্ত হাওয়া
ঢাকার রাজপথ,
একুশ আমার শহীদ হওয়া ভাই
সালাম, রফিক, বরকত
মুক্ত পাখির গান।
একুশ আমার বাঁচার দাবি
একুশ মায়ের বুলি
একুশ আমার শহীদ ভায়েদের
শাহাদাত বরন
একুশ আমার শহীদ ভায়েদের
কৃতজ্ঞতার স্মরণ।

একাত্তর অতঃপর
জোহরা মোস্তাফিজ

স্বাধীনতা চল্লিশ বৎসর পর
আজও দেখছি স্বাধীনতা শব্দটি পর!
ভোরে ঘুম থেকে উঠে চোখের সামনে
দেখি সেই রাঙা হাত, সেই মুনাফেক।
লেবাস পাল্টে আজ সাধু মহন্ত
এক খন্ডিত চিত্র একাত্তর
এইসব দালালরা হেন করেছিল
কল্পনার সীমানা উত্তরে গে'ছিল।
ভাইয়ের কাঁধে ভাই, বাপের সামনে
খুকার ছিন্ন ধড়-মাথা তপড়ানো
নিলর্জ বেহায়ার সম্ভ্রম লোটে
পশুর নখর বসে শরীরে হৃদয়ে।
আজও বসে যখন সেই শয়তান
আলিশান এসি বাসা, নেতাজী আসন
স্বাধীনতাকে শাসন করে বরাবর
শুধু ধরন পাল্টে মুখো ধারীর।

উজ্জ্বল নক্ষত্র
আশরাফুল হাসান বিপ্লব

বাতাসে ভেসে আসে
কান্নার সুর,
আকাশের বুক চিরে,
বেরিয়ে আসে অশ্রু
মাতৃভাষার নিরব কান্না,
শুনতে পাই
বাংলাভাষার গায়ে দেখি
আমি রক্তের দাগ।
আমি অবাক .... এত রক্ত!
এ যে ভাষা শহীদের রাস্তায়
পড়ে থাকা, লাশের রক্ত।
সাত-সাতটি প্রাণের বিনিময়ে
মাতৃভাষার, বিজয়ের উজ্জ্বল সূর্য
দেখি আমি শহীদ মিনারের বুকে।
তখনই হয়ে যাই আমি ভাবাতুর।
সাত শহীদের চিৎকার
আজ ও শুনতে পাই
বাংলা ভাষার গদ্য কবিতায়।
এযে আমার, মাতৃভাষার
হৃদয় গহিনের অহঙ্কার,
পৃথিবীর বুকে তুলে ধরা,
উজ্জ্বল এক নক্ষত্র।

ভাষার তরে
নজরুল ইসলাম

ছালাম, বরকত, রফিক, জব্বার,
তোমরা মোদের ভাই,
কেমনে সুধিব তোমাদের ঋণ,
এ ঋণ তো সুধিবার নয়।
দুঃখ নিয়ো না ভাই
অশ্রু ফেলো না দুঃখে,
তোমাদের নাম পথ প্রান্তরে
বাঙালীর মুখে মুখে।
আজ হয়েছে পূরণ
তোমাদের আশা
বড় স্বপ্নের বাংলা
হয়েছে রাষ্ট্র ভাষা।

ভাষার নানা মাত্রিকতা ঃ প্রেক্ষাপট ভারত উপমহাদেশ

- মোঃ আফসার আলী

অভিধানে মাতৃভাষা বলতে 'স্বদেশের ভাষা'কে বুঝানো হয়েছে, দেশ অর্থ মা। প্রকৃত পক্ষে 'স্বদেশের ভাষা' এই শাব্দিক অর্থের মধ্যে কিন্তু এর পরিপূর্ণতা নেই, এই অর্থে মনও ভরে না। ভাষার সাথে স্বদেশের সম্পর্কের গভীরে গেলে সেখানে ভাষার ভিন্ন মাত্রিকতা (Dimension) ধরা পড়ে। মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছাড়াও এর অন্যমাত্রা এবং সেই অন্যমাত্রিক ভূমিকা তখন পরিস্কার হয়। স্বদেশ শব্দের পাশাপাশি আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার অভিঘাতকে কেন্দ্র করেই ভাষা তার ভাব প্রকাশের মাত্রিকতা ছেড়ে ভিন্ন মাত্রিকতায় প্রবেশ করে, অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন হিসেবে সে এখানে ভিন্নমাত্রিক হয়ে পড়ে। প্রশ্ন হলোঃ সেই পীঠস্থানের প্রধান কেন হবু পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠির মাত্র ৬ ভাগ লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন ? তিনিতো কোন ফালতু লোক ছিলেন না, আবার রাজনীতিক ও ছিলেন না যে সস্তা কথা বলবেন। ড. জিয়াউদ্দিনের মুখ ফসকেও কথাটা আসেনি। পরবর্তীতে দেখতে পাই জিন্নাহর কথায়ও জিয়াউদ্দিনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই এর মূল খুজতে আমাদেরকে একটু পিছনে যেতে হবে।

বৃটিশ যুগ। ঘটনাটা ১৮৬৭ সালের, ঠিক সিপাহী বিদ্রোহের শেষ প্রহরে। ভারতের হিন্দু কর্তা ব্যক্তিরা বেনারসে একটা সভা করলেন। ঐ সভায় ভারতের অভিন্ন ভাষা হিসেবে নেতৃবৃন্দ হিন্দির পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। সেই থেকে 'হিন্দি' হিন্দুস্থানী ভাষা হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করল। হিন্দি কিন্তু দিল্লী এলাকার একটা শংকর ভাষা, ঐ ভাষায় (মুঘল শাসকদের ভাষা ফার্সি থাকায়) অনেক ফার্সি শব্দ যেমন যোগ হয় একই সাথে যোগ হয় স্থানীয় কিছু উপভাষা। মুঘল আমলে সেনা বাহিনীতে অভিন্ন ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রসার লাভ করে। ইংরেজ আমলে ওটারই নাম হয় 'হিন্দুস্থানী' ভাষা। উনিশ শতকের শুরুতেই ঐ হিন্দিভাষা সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে যায়। ধর্মীয় আবরণে হিন্দুস্থানী ভাষা দু'ভাগে বিভক্ত হয় (১) হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে ফার্সি শব্দ তুলে দিয়ে সেখানে সংস্কৃত শব্দ যুক্ত করে দেবনাগরী লিপির আশ্রয়ে নতুন করে হিন্দি নামে তা পরিচিতি পায় (২) এর বিপরিতে আরবী ফার্সি শব্দ সহ হিন্দুস্থানী ভাষা আরবী লিপিতে নতুন ভাবে 'উর্দু' নামে পরিচিতি পায়। ভাষা এখানে ধর্মাশ্রয়ী হয়ে পড়ে, অর্থাৎ ভাষার ধর্মেরে সৃষ্টি হয়। 'হিন্দি' হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ভাষা এর বিপরিতে উর্দু হয়ে পড়ে হিন্দুস্থানের মুসলমানের ভাষা। ফলতঃ মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সূচক হিসেবে উর্দুর আর্বিভাব হয়। হিন্দি ভারতবর্ষে অনেকটা অভিন্ন ভাষা (Lingua Franca) হিসেবে বিস্তৃত হলেও উর্দু কিন্তু মুসলমানের ভাষা হিসেবেই থেকে যায়। উর্দুভাষা এখানে ধর্মীয় মাত্রা (Dimension) নির্ভর হয়ে আত্মপরিচয়ের দিকে ধাবিত হয়। তাই সংখ্যা বিবেচনায় নয়, মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের দ্যোতক বিবেচনায় ড. জিয়াউদ্দিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ঐ উক্তি করেছিলেন। পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালীরা তাই বলে বসে থাকবে কেন ? তারা অতি সংগত কারণেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে তাদের অবস্থানে চলে যায়। ভাষা এখানে রাজনীতির মাত্রা (Dimension) নিয়ে আত্মপরিচয়ের পথে এগিয়ে যায়। এটা নতুন কিছু নয়, ভাষা রাজনীতি মাত্রিক হয়ে ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্য সমূহের সীমানাও বদলে দিয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিবেচনায় বাংলা ভাষার দাবী যেমন জোরদার হয়, শ্রীলংকার দিকে তাকালে সেখানে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের 'সিনহালা' ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেলেও সংখ্যালঘু 'তামিল' ভাষাভাষি হিন্দুরা আন্দোলন শুরু করে, সময়ের ব্যবধানে এল টি টি ই এর মত জঙ্গি সংগঠন সেখানে গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালে ভাষার প্রশ্নে বাঙালী প্রাণোৎসর্গ করলো, উপায়ন্ত র না দেখে পাকিস্তান ৫৬র সংবিধানে বাংলা আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা দানে বাধ্য হল। একই ধারায় ১৯৬১ সালে আসামের বারাক উপত্যকায় অসমী ভাষাভাষী মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে, সেখানেও প্রণোৎসর্গ ঘটে। ইতোপূর্বে ১৯৫৩ সালে পন্ডিত নেহেরুর বিরোধিতা সত্ত্বেও তেলেগু ভাষাভাষী অন্ধ্রের মানুষ অন্ধ্রকে পৃথক প্রদেশের মর্যাদা আদায় করেছিল। একই ধারায় ইতোপূর্বে ১৯৬১ সালে ভারতের অধিনস্থ পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে পাঞ্জার ও হরিয়ানা দুটি রাজ্যের মর্যাদা পায়, এখানে পাঞ্জাবের ভাষা হয় পাঞ্জাবী, হরিয়ানার ভাষা হয় হিন্দি। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানি সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি যেমন বাংলা আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা পায় তেমনি ভারতীয় সংবিধানে হিন্দির পাশাপাশি পনেরটি ভাষা আঞ্চলিক মর্যাদা পায় যেগুলোঃ অসমী, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়া, কাশ্মিরি, মালায়ালাম, মারাঠি, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত ও উর্দু।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর বেনিয়া বৃটিশের চূড়ান্ত আঘাত ছিল বঙ্গভঙ্গ, সেই সূত্রে '৪৭এর বঙ্গবিভক্তি, পাকিস্তানের সৃষ্টি। বেনিয়াদের 'ভাগকর - শাসনকর' নীতির অনিবার্য ফল হিসেবে বাংলা বিভক্ত হলে '৪৭ সালের ১৩ আগষ্ট অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বাধ্য হয়ে প্রফুল ঘোষ ও নাজিমুদ্দিনের কাছে দুই বাংলার ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন। বেনিয়া নীতির চাপে সেদিন সোহরাওয়ার্দী -শরৎ বসুর অভিন্ন বাংলার স্বপ্ন ধূলোয় মিশে গিয়েছিল। তার পরও বাংলা ভাষা কিন্তু হারিয়ে গেল না, স্বমহিমায় পূর্ব ও পশ্চিমে সগর্বে দাড়িয়ে রইল। ভারতীয় সংবিধানে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি ধারায় ৫৬র সংবিধানে পাকিস্তানে বাংলার স্বীকৃতিবাংলা ভাষারম-হিমা কীর্তন করে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির আদলে পাকিস্তানিরা উর্দুকে 'মুসলমান' পরিচয়ের দ্যোতক এই বিবেচনায় বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার নানা মাত্রিক ষড়যন্ত্রের অবতারনা করে। ভারত বর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে উর্দুভাষি মধ্য ভারত থেকে-পরবর্তীতে ওহাবী আন্দোলনের সূচনাও সেখান থেকে। এমনিতে মুসলমানদের পশ্চিমের প্রতি একটু বাড়তি প্রীতি আছে, তার পর কেতাব, কুরআন সংক্রান্ত বই গুলো ছাপা হতো উর্দু ভাষায়। ফলে বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি হরণে পাকিস্তানিরা মুসলমানদের অনগ্রসরতা একই সাথে পশ্চিম প্রীতিকে আশ্রয় করে এগিয়ে যায়। ভাষাকে ধ্বংস করতে তারা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নীতি বহির্ভূত আশরাফ- আতরাফ শ্রেণী বিভেদও করে ফেলে। লক্ষ্য করা যায় বাংলার পশ্চিম অংশের চেয়ে পূর্ব অংশের উপর পাকিস্তানি কলোনিয়াল চরিত্রের উৎকট প্রকাশ ঘটেছিল। লক্ষ্যনীয় যে ইংরেজ কলোনিয়াল যুগে গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণে ইংরেজ কখনো ভারতীয় হতে পারেনি পক্ষান্তরে অনেকটা অভিন্ন গাত্রবর্ণ এবং অভিন্ন ধর্ম পাকিস্তনী শাসকদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল- তারা ঐ সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগিয়েছিল। তারা শরিফ কিংবা আশরাফদের ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করে বাংলাকে বিভক্ত করতে মোটেও পিছপা হয়নি।

বাহান্নর একুশ রাজনীতির আশ্রয়ে দ্রুত পত্র পলবে পুষ্পিত হয়। সংস্কৃতির টান দ্রুত ধর্মীয় বন্ধনকে ছিড়ে ফেলে। ভাষাকে সামনে নিয়ে ৬৬,৬৯ হয়ে আমরা ৭১এ প্রবেশ করি। এসময়কালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষা আমাদের সহায়ক হয়েছে ভাষা জাতীয়তা সৃজন করেছে, পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়েছে। সময়ের সিড়িতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর বাঙালীর একুশকে বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশে আন্ত র্জাতিক অন্যান্য দিবসের ন্যায় একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার পূর্ব অংশে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ মিলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা একুশ কোটিরও অধিক। 'মাতৃভাষা অস্তিত্বের সমার্থক' এই নিরিখে বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ তার অস্তি ত্বের সন্ধান পেয়েছে একথা সত্য, এর পাশাপাশি বাংলার পূর্ব-পশ্চিম বিভক্তি আমাদের ভবিষ্যৎকে যে প্রভাবিত করবে তাও তেমনি সত্য। সকল ক্ষেত্রে ভাষার অভিন্নতা আমাদেরকে রক্ষা করবে।

এক নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধার গান
ডাঃ অমল কান্তি সরকার

আমি যদি বেছে না থাকতাম
সেই তো আমার ভালো ছিল।
আজ আমাকে এতো অপমান
এতো যন্ত্রনা সইতে হলো॥
মৃত্যুর দুয়ার থেকে আমি
ফিরে এসেছি কতবার,
আমি বেঁচে আছি সে খোঁজ
রাখে না কেউ একবার
এমনটি দেখবো দু'নয়ন ভরে
এই কি আমার ভাগ্যে ছি॥
এ দেশ কখনো ভালো হবে না
সেই তো আমার বিশ্বাস,
কষ্টে কষ্টে একদিন আমার
বন্ধ হবে শেষ নিঃশ্বাস।
দেশ মাতৃকা রক্ষা করতে
একাত্তরে কে আমাকে অস্ত্র দিল॥

মহান একুশ
৬পলাশ সিংহ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি।
৬০ বছর পার হয়েছে
তব না ভুলিতে পারি
রফিক ,শফিক, করকত আরও
হারিয়েছি কত শত প্রাণ ॥
একুশ আসলেই দেশের সবাই
করি তাদের সম্মান ॥
ইতিহাসের পাতায় তারা
রইবে চির অমলীন
ভুলিবনা আমরা শহীদ সন্তানদের
ভুলিবনা কোন দিন।
অনেক যুদ্ধে, অনেক রক্তে
রাঙানো এই দেশ,
সবুজে ভরা শস্যে ভরা
রুপের নেইকো শেষ ॥

শূন্য
মোঃ মনিরুজ্জামান

হঠাৎ গলাভরা হাসি মুচ্ছা গেল
নেমে আসল অন্ধকার।
আলোকিত আখি হল মলিন
বুক চিরে নেমে এল জল।
থাকলোনা কেউ আপন বলে
সকলে গেল সকলের তরে
আকাঙ্খাহীন খাচার পেরোয়া পক্ষি
অস্তিত্বহীনতার বিভোর চিত্ত!
হীনমন্যতার করুন গ্রাসে সে বিক্ষত
বিনষ্ট তার চালিকা শক্তি।
প্রশ্ন তাকে কুড়ে কুড়ে মারছে
সেকি পারবে ? কি করবে সে ?
শুন্যের পথ বেকে নেবে! / নাকি......!!!
সামনে তার অপরা সম্ভাবনা
আয়ুষ্কালে চিন্তাগুলো ভ্রান্ত হল তার
পেল নতুন জীবনীশক্তি
বাঁচতে শিখলো সে
জীবনের নামে বলিদিল তার ক্রোধ, ক্ষোভ
ফিরে পেল সৃজনশীল স্বীয় সত্বা।
আপন মহিমায় মহিমান্বিত
করলো নিজেকে
শান্তি পেল সে / শান্ত হল শুন্যে।

একুশ আমার মাতৃভাষার গান
শাহানুর আলম উজ্জল

একুশ আমার মাতৃভাষার গান শোনাবার দিন।
একুশ আমার বাংলা মায়ের ভালবাসার ঋণ ॥
একুশ আমার বাল্য বেলার লাটিম খেলার সুতা।
একুশ আমার মান ভাংগানো অভিমানি মাতা ॥
একুশ আমার ডাংগুলিতে ঘূর্ণী পাকের লাঠি।
একুশ আমার আঁচল স্নেহের বাংলা শীতল পাটি ॥
একুশ আমার বাঁসর রাতের লাজুক বধূর হাসি।
একুশ আমার উদ্দীপনার জোয়ান কালের বাঁশি ॥
একুশ আমার লাল সবুজের দেপান্তরের মাঠ।
একুশ আমার ফুল বসন্তে মিলন মেলার হাট ॥
একুশ আমার বুড়ো দাদার হুকোঁয় সুখের টান।
একুশ আমার দীপ্ত আলোর নওজোয়ানের বান ॥
একুশ আমার কামার বাড়ির ঠকঠকানির কাজ।
একুশ আমার কুমোর বাড়ির হাঁড়ি পাতিলের সাজ ॥
একুশ আমার শিমুল তলায় ঢেঁকি পাতার নাচা।
একুশ আমার ডগায় ডগায় পূর্ণ লাউয়ের মাঁচা ॥
একুশ আমার স্রোতস্বীনি কপোতাক্ষের জল।
একুশ আমার রক্তকরবী স্বাধীনতার ফল ॥
একুশ আমার রাঙা রাজপথ, সালামের ক্ষত খুলি।
একুশ আমার রফিকের চিৎকারে মাতৃভাষার বুলি ॥
একুশ আমার ক্ষত-বিক্ষত শফিকের হৃদপিন্ড।
একুশ আমার বরকতের-ই ফুঁটো ফুসফুস খন্ড ॥
একুশ আমার বুনো শুকোরের কেড়ে নেয়া অধিকার।
একুশ আমার রক্ত সাগরে ভেসে যাওয়া হাহাকার ॥
একুশ আমার মায়ের ভাষা মৌলিক স্বাধীনতা।
একুশ আমার শেষ শ্রদ্ধা নিশ্চল নীরাবতা ॥

একুশ মানে
আরিফুজ্জামান জয় (৫ম শ্রেণীর ছাত্র)

একুশ মানে বিপ্লব এক
একুশ আমার অহংকার,
একুশ আমার স্বাধীনতার
সারা দেহের অলংকার !
একুশ আমার বুকের ভেতর
একুশ তো নয় একটি দিন,
একুশ তোমার কাছে জাতির
রয়েই গেলো হাজার ঋণ !